সালাত বর্জনকারীর বিধান

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল-‘উসাইমীন

অনুবাদ : মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

حكم تارك الصلاة

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। সুতরাং আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল; আর তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা তাঁদের যথাযথ অনুসরণ করেন, তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

অতঃপর:

আধুনিককালে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে, যারা সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী থাকে এবং তাকে বিনষ্ট করে, এমনকি

তাদের একটি অংশ অলসতা ও অবহেলা করে তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে।

আর যখন এই বিষয়টি এমন একটি জটিল সমস্যা, যে সমস্যার দ্বারা আজকের জনগণ জর্জরিত এবং ইসলামী উম্মাহর আলেম ও ইমামগণ প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তার ব্যাপারে মতবিরোধ করে আসছেন, তখন আমি এই বিষয়ে যথসম্ভব কিছু একটা লেখার ইচ্ছা পোষণ করেছি।

আর আলোচনাটি দুইটি পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হবে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: সালাত বর্জনকারীর বিধান প্রসঙ্গে;

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সালাত বর্জনের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধানাবলী প্রসঙ্গে।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, যাতে আমারা এই ব্যাপারে সঠিক বিষয়টি তুলে ধরতে পারি।

* * *

প্রথম পরিচ্ছেদ

সালাত বর্জনকারীর বিধান

নিশ্চয় এই বিষয়টি অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্য থেকে অন্যতম বড় একটি বিষয়, যার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের আলেমগণ বিতর্ক বা মতবিরোধ করেছেন; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. বলেন:

« تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة ، يقتل إذا لم يتب ويصل »

“সালাত বর্জনকারী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কার হয়ে যাওয়ার মত কাফির; সে তাওবা করে সালাত আদায় করা শুরু না করলে তাকে হত্যা করা হবে।”

আর ইমাম আবূ হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী র. বলেন: “সে ফাসিক হবে, কাফির হবে না।”

অতঃপর তাঁরা (তিনজন) তার শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন; ইমাম মালেক ও শাফেয়ী র. বলেন: “তাকে হদ তথা শরী‘য়ত নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে।” আর ইমাম

আবূ হানিফা র. বলেন: “তাকে তা‘যীরী তথা শাসনমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে, হত্যা করা হবে না।”

আর এই মাসআলাটি (বিষয়টি) যখন একটি বিরোধপূর্ণ মাসআলা, তখন আবশ্যক হল এটাকে আল্লাহ তা‘আলার কিতাব এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর সামনে পেশ করা; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ﴾ [الشورا: ١٠]

“আর তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, তার ফয়সালা তো আল্লাহরই কাছে।” – (সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১০); আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ [النساء: ٥٩]

“অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্‌ ও রাসূলের নিকট, যদি তোমরা আল্লাহ্‌ ও

আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।” – (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯)।

তাছাড়া মতভেদকারীগণের একজনের কথাকে অপরজনের জন্য দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না; কারণ, তাদের প্রত্যেকেই নিজের মতকে সঠিক মনে করে এবং তাদের একজন মত গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে অপরজনের মতের চেয়ে অধিক উত্তম নয়; ফলে এই ব্যাপারে তাদের মাঝে মীমাংসা করার মত একজন মীমাংসাকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে; আর সেই মীমাংসাকারী হল আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।

আর আমরা যখন এই বিরোধটিকে কুরআন ও সুন্নাহর নিকট উপস্থাপন করব, তখন আমরা দেখতে পাব যে, কুরআন ও সুন্নাহর মত শরী‘য়তের উভয় উৎসই সালাত বর্জনকারী ব্যক্তির কাফির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা ও প্রমাণ পেশ করে, যা এমন মারাত্মক পর্যায়ের কুফরী, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ (বহিষ্কার) করে দেয়।

প্রথমত: আল-কুরআন থেকে দলীল-প্রমাণ:

আল্লাহ তা‘আলা সূরা তাওবার মধ্যে বলেন:

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ ﴾ [التوبة: ١١]

“অতএব তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই।” – (সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১১); আর সূরা মারইয়ামের মধ্যে তিনি বলেন:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا ٦٠ ﴾ [مريم: ٥٩، ٦٠]

“তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তারা নয়, যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না।” – (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯ - ৬০)।

সুতরাং সূরা মারইয়াম থেকে (আলোচ্য প্রবন্ধে) উল্লেখিত দ্বিতীয় আয়াত সালাত বর্জনকারীর কুফরী এইভাবে প্রমাণ করে যে,

আল্লাহ তা‘আলা সালাত বিনষ্টকারী ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণকারীদের সম্পর্কে বলেন:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [مريم: ٦٠]

“কিন্তু তারা নয়, যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে।” – (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬০); সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা সালাত বিনষ্ট করার সময় এবং মনের কামনা-বাসনার অনুসরণ কালে মুমিন ছিল না।

আর সূরা তাওবা থেকে (আলোচ্য প্রবন্ধে) উল্লেখিত প্রথম আয়াত সালাত বর্জনকারীর কুফরী এইভাবে প্রমাণ করে যে, এতে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সাব্যস্ত করার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন:

১. শির্ক থেকে তাওবা করে ফিরে আসা;

২. সালাত আদায় করা;

৩. যাকাত প্রদান করা।

সুতরাং তারা যদি শির্ক থেকে তাওবা করে, কিন্তু সালাত আদায় না করে এবং যাকাত প্রদান না করে, তাহলে তারা আমাদের ভাই নয়। আর তারা যদি সালাত আদায় করে, কিন্তু যাকাত প্রদান না করে, তবুও তারা আমাদের ভাই নয়।

আর দীনী ভ্রাতৃত্ব তখনই পুরোপুরিভাবে নির্বাসিত হয়, যখন মানুষ দীন থেকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। ফাসেকী ও ছোট কুফরীর কারণে দীনী ভ্রাতৃত্ব খতম হতে পারে না।

তুমি কি দেখ না যে, হত্যার প্রসঙ্গে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বাণী, যাতে তিনি বলেছেন:

﴿ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾

[البقرة: ١٧٨]

"তবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কোন ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার রক্ত-বিনিময়

আদায় করা কর্তব্য।” – (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৮); এখানে আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম বড় ধরনের কবীরা গুনাহ; কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣ ﴾ [النساء: ٩٣]

“আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।” – (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৩)।

অতঃপর তুমি দেখ আল্লাহ তা‘আলার ঐ বাণীর দিকে, যাতে মুমিনগণের দুই দলের মধ্যে সংঘটিত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; তিনি বলেছেন:

﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ ﴾ [الحجرات: ٩، ١٠]

“আর মুমিনদের দু’দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন। মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।” – (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯ - ১০)। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা সংস্কারপন্থী গ্রুপ এবং পরস্পর যুদ্ধরত দুই দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অবশিষ্ট থাকার কথা ঘোষণা করেছেন, অথচ মুমিন ব্যক্তির সাথে লড়াই করা কুফরী কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; ইমাম বুখারী র. এবং

অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » .

“মুসলিমকে গালি দেয়া পাপ কাজ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী।”[১] কিন্তু তা এমন কুফরী, যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে না; কেননা, যদি তা মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কারকারী হত, তাহলে তার সাথে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অটুট থাকত না, অথচ উক্ত আয়াতটি মারামারিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ঈমানী ভ্রাতৃত্ব বহাল থাকা প্রমাণ করে।

আর এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সালাত ত্যাগ করা এমন কুফরী কাজ, যা সালাত বর্জনকারী ব্যক্তিকে দীন ইসলাম থেকে খারিজ

---

[১] বুখারী, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر), হাদিস নং- ৪৮; মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: মুসলিমকে গালি দেয়া গুনাহর কাজ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী (باب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »), হাদিস নং- ৬৪

করে দেয়; কেননা, তা যদি ফাসেকী অথবা যেনতেন নিম্নমানের কুফরী হত, তাহলে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সালাত বর্জনের কারণে নির্বাসিত হয়ে যেত না, যেমনিভাবে তা (ঈমানী ভ্রাতৃত্ব) বিলুপ্ত হয়ে যায় না মুমিনকে হত্যা করা এবং তার সাথে মারামারি করার কারণে।

আর যদি কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে যে, আপনারা কি যাকাত আদায় না করার কারণে কেউ কাফির হয়ে যাবে বলে মনে করেন? যেমনটি সূরা তাওবার আয়াত থেকে বুঝা যায়।

জবাবে আমরা বলব: কতিপয় আলেমের মতে, যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে; আর এটা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. এর থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটি।

কিন্তু আমাদের নিকট জোরালো মত হল, সে কাফির হবে না, তবে তাকে ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে আলোচনা করেছেন; আর নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন তাঁর সুন্নাহর মধ্যে; তন্মধ্যে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে আছে, তাতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত দানে বিরত থাকা ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন; আর সেই হাদিসের শেষ অংশে রয়েছে:

« ثم يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » .

“অতঃপর তাকে তার পথ দেখানো হবে- হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।” ইমাম মুসলিম র. হাদিসটি “যাকাতে বাধাদানকারীর অপরাধ” (باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ) নামক পরিচ্ছেদে দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করেছেন।”[২] আর এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, সে কাফির হবে না; কারণ, সে যদি কাফির হয়ে যেত, তাহলে তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার কোনো পথ থাকত না।

[২] মুসলিম, অধ্যায়: যাকাত (كتاب الزكاة), পরিচ্ছেদ: যাকাতে বাধাদানকারীর অপরাধ (باب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ), হাদিস নং- ৯৮৭

অতএব, এই হাদিসটির সরাসরি বক্তব্য সূরা তাওবার আয়াতের ভাবার্থের উপর প্রাধান্য পাবে; কারণ, সরাসরি বক্তব্য ভাবার্থের উপর প্রাধান্য পায়, যেমনটি জানা যায় ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিমালার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত: আস-সুন্নাহ থেকে দলীল-প্রমাণ:

১. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ »

“কোনো লোক এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।” ইমাম মুসলিম র. হাদিসটি কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে জাবির ইবন আবদিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।”[৩]

[৩] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: সালাত পরিত্যাগকারীর উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ (باب بَيَانِ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ), হাদিস নং- ২৫৬

২. বুরাইদা ইবন হোসাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر » . (رواه أحمد و الترمذي و النسائي و ابن ماجه)

“আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার বা চুক্তি হল সালাতের, সুতরাং যে ব্যক্তি তা বর্জন করল, সে কুফরী করল।” - (আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)।”[8]

আর এখানে কুফর (الكفر) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন কুফরী যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মুসলিম মিল্লাত (সম্প্রদায়) থেকে বের করে দেয়;

---

[8] আহমদ: ৫ / ৩৪৬; তিরমিযী, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: সালাত বর্জন প্রসঙ্গে যেসব হাদিস এসেছে (باب ما جاء في ترك الصلاة), হাদিস নং- ২৬২১ এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব; নাসায়ী, অধ্যায়: সালাত (كتاب الصلاة), পরিচ্ছেদ: সালাত বর্জনকারীর বিধান প্রসঙ্গে (باب الحكم في تارك الصلاة), হাদিস নং- ৪৬৩; ইবনু মাজাহ, অধ্যায়: সালাত কায়েম করা (كتاب إقامة الصلاة), পরিচ্ছেদ: সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি প্রসঙ্গে যেসব হাদিস এসেছে (باب ما جاء فيمن ترك الصلاة), হাদিস নং- ১০৭৯

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন ও কাফিরদের মাঝে সালাতকে পৃথককারী সূচক বানিয়ে দিয়েছেন; আর এটা সকলের নিকট সুবিদিত যে, কাফির মিল্লাত এবং মুসলিম মিল্লাত একে অপরের বিপরীত; ফলে যে ব্যক্তি এই (সালাতের) অঙ্গীকার পূরণ করবে না, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩. আর সহীহ মুসলিমের মধ্যে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« سَتَكُونُ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ » . قَالُوا : أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : « لاَ مَا صَلَّوْا » . (رواه مسلم) .

“অচিরেই এমন কতক আমীরের (নেতার) উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের কিছু কর্মকাণ্ডের ভালো-মন্দ চিনতে পারবে, আর কিছু কর্মকাণ্ড অপছন্দ করবে; সুতরাং যে ব্যক্তি স্বরূপ চিনে নিল, (কোনোরূপ সন্দেহে পতিত না হয়ে তা থেকে বাঁচার জন্য কোনো উপায় বেছে নিল) সে মুক্তি পেল; আর যে ব্যক্তি তাদেরকে অপছন্দ করল, সে (গুনাহ থেকে) নিরাপদ হল; কিন্তু যে ব্যক্তি

তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলরেন: না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।” - (মুসলিম)।”[৫]

৪. আর সহীহ মুসলিমের মধ্যে ‘আউফ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ : « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ » . (رواه مسلم) .

[৫] মুসলিম, অধ্যায়: নেতৃত্ব বা প্রশাসন (كتاب الإمارة), পরিচ্ছেদ: শরী‘য়ত গর্হিত কাজে আমীরের আনুগত্য বর্জন করা ওয়াজিব, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত আদায় করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না (باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ), হাদিস নং- ৪৯০৬

“তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে; আর তারা তোমাদের জন্য দো‘আ করে এবং তোমরাও তাদের জন্য দো‘আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করা এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে; আর তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারী দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়েম রাখবে।” - (মুসলিম)।”[৬]

সুতরাং এই শেষ দু‘টি হাদিসের মধ্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, নেতাগণ যখন সালাত কায়েম করবে না, তখন তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করা আবশ্যক হবে; আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা যুদ্ধ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের নিকট

---

[৬] মুসলিম, অধ্যায়: নেতৃত্ব বা প্রশাসন (كتاب الإمارة), পরিচ্ছেদ: উত্তম শাসক ও অধম শাসক (باب خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ), হাদিস নং- ৪৯১০

আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে; কেননা, ওবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

« دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ » . قَالَ : « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ » . (رواه البخاري و مسلم) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন, তারপর আমরা তাঁর নিকট বায়‘আত গ্রহণ করলাম; তিনি তখন আমাদেরকে যে শপথ গ্রহণ করান, তার মধ্যে ছিল: আমরা আমাদের সুখে ও দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণাঙ্গরূপে শোনা ও মানার উপর বায়‘আত করলাম। আরো (বায়‘আত করলাম) আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন: তবে যদি তোমরা এমন সুস্পষ্ট কুফরী দেখ, যে বিষয়ে

তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে ভিন্ন কথা।” - (বুখারী ও মুসলিম)।”[৭]

আর এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়- তাদের সালাত বর্জন করা সুস্পষ্ট কুফরী বলে বিবেচিত হবে, যার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে তরবারী নিয়ে লড়াই করার বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে আমাদের জন্য জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে।

আর কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে কোথাও বর্ণিত হয় নি যে, সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি কাফির নয় অথবা সে মুমিন; বড়জোর এই ব্যাপারে (কুরআন ও সুন্নায়) এমন কতগুলো ভাষ্য এসেছে, যা তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের ফযীলত এবং এর সাওয়াবের প্রমাণ বহন করে; আর সে তাওহীদ হল: এ কথার সাক্ষ্য প্রদান

[৭] বুখারী, অধ্যায়: ফিতনা (كتاب الفتن), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমার পরে তোমার এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমরা পছন্দ করবে না (باب قول النبي صلى الله عليه و سلم (سترون بعدي أمورا تنكرونها), হাদিস নং- ৬৬৪৭; মুসলিম, অধ্যায়: নেতৃত্ব বা প্রশাসন (كتاب الإمارة), পরিচ্ছেদ: পাপের কাজ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে শাসকের আনুগত্য করা জরুরি, আর পাপ কাজের ব্যাপারে তা করা হারাম (باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِى الْمَعْصِيَةِ), হাদিস নং- ৪৮৭৭

করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তবে এ ভাষ্যগুলোরও রয়েছে কয়েকটি অবস্থা,

* সে সকল ভাষ্যে রয়েছে এমন কিছু শর্ত, যে শর্তের কারণেই সালাত ত্যাগ করা যায় না;

* অথবা তা এমন এক বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে, যাতে সালাত ত্যাগ করার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মা‘যুর বা অপারগ বলা যেতে পারে;

* অথবা ভাষ্যগুলো ব্যাপক (عام), যা সালাত বর্জনকারী কাফির হওয়ার দলীলসমূহের উপর প্রযোজ্য হবে; কারণ, সালাত বর্জনকারী কাফির হওয়ার দলীলসমূহ বিশেষ (خاص) দলীল; আর খাস (বিশেষ দলীল) ‘আমের (ব্যাপকতাপূর্ণ দলীলের) উপর অগ্রাধিকার পাবে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি বলে: এই কথা বলা কি সঠিক হবে না যে, যেসব দলীল সালাত বর্জনকারী কাফির হওয়া প্রমাণ করে,

সেগুলো ঐ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি সালাতের আবশ্যকতাকে অস্বীকারকারী হিসেবে তা বর্জন করে?

জবাবে আমরা বলব: এটা সঠিক নয়; কারণ, তা দু’টি কারণে নিষিদ্ধ:

প্রথম কারণ: সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে উপক্ষো করা, যাকে শরী‘য়তপ্রবর্তক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তার সাথে বিধান সংশ্লিষ্ট করেছেন।

কারণ, শরী‘য়তপ্রবর্তক সালাত ত্যাগ করাকেই কুফরী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা সালাত অস্বীকার করার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। তাছাড়া সালাত প্রতিষ্ঠার উপর দীনী ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, সালাতের আবশ্যকতার স্বীকৃতির প্রদানের উপর নয়; কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেন নি: সুতরাং তারা যদি তাওবা করে এবং সালাতের আবশ্যকতাকে স্বীকার করে ...; আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলেননি: বান্দা এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাতের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করা, অথবা তিনি বলেন নি: আমাদের ও তাদের মাঝে অঙ্গীকার বা চুক্তি হল সালাতের

আবশ্যকতার স্বীকৃতি প্রদান করা, সুতরাং যে ব্যক্তি তার আবশ্যকতাকে অস্বীকার করল, সে কুফরী করল[৮]।

আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য এটা[৯]ই হতো, তাহলে তা থেকে অন্য দিকে প্রত্যাবর্তন করাটা সেই কথার পরিপন্থি হত, যে বক্তব্য আল-কুরআনুল কারীম নিয়ে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ ﴾ [النحل: ٨٩]

"আমি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি।" – (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯)। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ ﴾ [النحل: ٤٤]

---

[8] অর্থাৎ এটা বলেন নি, বরং আল্লাহ বলেছেন, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের জন্য শর্ত হচ্ছে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শির্ক ও কুফরির মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেওয়া; সুতরাং উপরোক্ত বিধান সালাতের আবশ্যকতা অস্বীকার করার উপর নয়, বরং সালাত পরিত্যাগ করাই হচ্ছে কাফের হওয়ার কারণ। [সম্পাদক]

[9] 'সালাত কায়েম করা' উদ্দেশ্য না হয়ে, 'সালাতের আবশ্যকতাকে স্বীকার করা'ই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে আল্লাহ যে কুরআনুল কারীমকে সবকিছুর স্পষ্ট বর্ণনাকারী হিসেবে নাযিল করেছেন বলে জানিয়েছেন সেটার বিপরীত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা কখনো হতে পারে না। [সম্পাদক]

“আর আমি তোমার প্রতি যিকির (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিতে পার সেসব বিষয়, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।” – (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৪)।

দ্বিতীয় কারণ: এমন এক গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রাখা, যার উপর শরী‘য়তপ্রবর্তক কোনো বিধানের ভিত্তি রাখেননি।

কেননা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা কুফরি; যদি না সে ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়টি না জানার কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর না থাকে, চাই সে সালাত আদায় করুক অথবা ত্যাগ করুক। অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে এবং তার নির্ধারিত শর্তাবলী, আরকান (ফরয), ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহসহও যথাযথভাবে আদায় করে, কিন্তু সে তার (সালাতের) ফরয হওয়ার বিষয়টিকে বিনা ওজরে অস্বীকার করে, তাহলে সে সালাত বর্জন না করা সত্ত্বেও কাফির বলে বিবেচিত হবে।

সুতরাং এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উপরে বর্ণিত (সালাত ত্যাগকারী কাফের হওয়া বিষয়ক) শরী'য়তের ভাষ্যসমূহকে যে ব্যক্তি সালাতের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করে- তার জন্য নির্ধারণ করা সঠিক নয়; বরং সঠিক কথা হল, (এগুলোকে সালাত পরিত্যাগকারীর উপর প্রয়োগ করা হবে, সে হিসেবে) সালাত বর্জনকারী এমন কাফির হিসেবে গণ্য হবে, যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়; যেমনটি পরিষ্কারভাবে এসেছে ইবনু আবি হাতিম কর্তৃক তাঁর সুনানে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে, তিনি 'উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

« أوصانا رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تتركوا الصلاة عمدا ، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة » .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন: তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত বর্জন করো না; কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত বর্জন করবে, সে ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যাবে।”

আর আমরা যদি উপরোক্ত কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যসমূহকে (যাতে সালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়েছে) সালাতের আবশ্যকতা অস্বীকারকারীর জন্য নির্ধারণ করি, তাহলে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষভাবে সালাতকেই উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না; কারণ, এই বিধান সাধারণভাবে যাকাত, সাওম ও হাজ্জকেও শামিল করে; কেননা যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটিরও আবশ্যকতাকে অস্বীকারকারী হয়ে তা বর্জন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে, যদি না সেটা না জানার ব্যাপারে তার কোনো ওজর থাকে[১০]।

আর যেমনিভাবে সালাত বর্জনকারীর কাফির হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদিসের দলীলসম্মত, ঠিক তেমনিভাবে তা জ্ঞান ও যুক্তিসম্মতও। কারণ, এমন সালাত ত্যাগ করার পরেও কিভাবে

---

[10] অর্থাৎ, ইসলামের যে কোনো প্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকারকারীই কাফের, সেটা সালাতের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হলেও। যা উম্মতের সর্বসম্মত মত। সুতরাং যদি উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহকে সালাত পরিত্যাগকারীর উপর নির্ধারণ না করে সালাত অস্বীকারকারীর জন্য নির্ধারণ করা হয়, তবে সালাতকে নির্দিষ্ট করে এ সব ভাষ্যের কোনো বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না। কারণ, অন্যান্য বিষয় অস্বীকারকারীও যদি কাফের হয়ে যায়, তবে সালাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের এসব ভাষ্যের প্রয়োজন পড়ে না। তাই বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারেই এসব ভাষ্য প্রযোজ্য হবে। [সম্পাদক]

কোনো ব্যক্তির ঈমান থাকতে পারে, যে সালাত হচ্ছে দীনের খুঁটি? যার ফযীলত ও মাহাত্মের বর্ণনা এমনভাবে হয়েছে, যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মুমিন ব্যক্তি তা প্রতিষ্ঠার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হবে; আর সেই সালাত বর্জন করার অপরাধে এমন শাস্তির হুমকি এসেছে, যাতে প্রত্যেক জ্ঞানী মুমিন ব্যক্তি তা বর্জন ও বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকবে। অতএব, এই পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সালাত বর্জন করলে বর্জনকারীর ঈমান অবশিষ্ট থাকতে পারে না।

তবে কোনো প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করে বলে: সালাত বর্জনকারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কুফর (الكفر) শব্দটির অর্থ কি কুফরে মিল্লাত (দীন অস্বীকার) না হয়ে কুফরে নিয়ামত (নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা) হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না? অথবা তার অর্থ কি বৃহত্তর কুফরী না হয়ে ক্ষুদ্রতর কুফরী হতে পারে না? তা কি হতে পারে না নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর মত, যাতে তিনি বলেছেন:

« اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » .
(رواه مسلم) .

“দু’টি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দু’টি কুফর বলে গণ্য: (১) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং (২) উচ্চস্বরে বিলাপ করা।”[১১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»

“মুসলিমকে গালি দেয়া পাপ কাজ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী।”[১২] অনুরূপ আরও অন্যান্য হাদিস।

তার জবাবে আমরা বলব: সালাত ত্যাগকারীর কুফরীর বিষয়ে এ ধরনের সম্ভাবনা ও উপমা প্রদান কয়েকটি কারণে সঠিক নয়:

---

[১১] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ (باب إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ), হাদিস নং- ২৩৬

[১২] বুখারী, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: অজ্ঞাতসারে মুমিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر), হাদিস নং- ৪৮; মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: মুসলিমকে গালি দেয়া গুনাহর কাজ এবং তার সাথে মারামারি করা কুফরী (باب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »), হাদিস নং- ৬৪

প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতকে কুফর ও ঈমানের মাঝে এবং মুমিনগণ ও কাফিরদের মাঝে পৃথককারী সীমানা বানিয়ে দিয়েছেন। আর সীমানা তার অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে অন্যান্য ক্ষেত্রে থেকে পৃথক করে এবং এক এলাকাকে অন্য এলাকা থেকে বের করে দেয়; কারণ, নির্ধারিত ক্ষেত্র দু'টির একটি অপরটির বিপরীত, যাদের একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে না।

দ্বিতীয়ত: সালাত হচ্ছে ইসলামের রুকনসমূহের (স্তম্ভসমূহের) একটি অন্যতম রুকন; কাজেই সালাত বর্জনকারীকে যখন কাফির বলা হয়েছে, তখন পরিস্থিতির দাবি করে যে, সেই কুফরী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়; কারণ, সে ব্যক্তি ইসলামের রুকনসমূহের একটি রুকনকে ধ্বংস করল; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী কর্মসমূহের কোন কাজ করে ফেলল, তার উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ করার বিষয়টি এর (সালাতের বিধানের) চেয়ে ভিন্ন রকম।

তৃতীয়ত: এই ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে, যা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সালাত বর্জনকারী এমন কুফরীতে আক্রান্ত, যা

তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়; তাই কুফরীর সেই অর্থই নেয়া আবশ্যক, যা দীললসমূহ প্রমাণ করে, যেন এসব দলীল একে অপরের অনুকুলে এবং সম্মিলিতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

চতুর্থত: কুফর (الكفر) শব্দের ব্যাখ্যা বা প্রকাশ-রীতি বিভিন্ন রকম; সুতরাং সালাত বর্জনের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ ».

“বান্দা এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা।”[১৩] এখানে আল-কুফর (الكفر) শব্দটি আলিফ লাম (ال) যোগে ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, কুফরের অর্থ হচ্ছে প্রকৃত কুফরী। কিন্তু আলিফ লাম (ال) ছাড়া কুফর (كفر) শব্দটি যখন নাকেরা (অনির্দিষ্ট) হিসেবে ব্যবহৃত হয় অথবা কাফারা (كَفَرَ) শব্দটি ফেল (ক্রিয়া) হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা প্রমাণ করে যে, এটা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত অথবা সে এই কাজের

[১৩] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: সালাত পরিত্যাগকারীর উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ (باب بَيَانِ إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ), হাদিস নং- ২৫৬

ক্ষেত্রে কুফরী করেছে; আর সেই সাধারণ কুফরী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ (বের) করে দেয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা র. (আস-সুন্নাতুল মুহাম্মাদীয়া প্রকাশনা কর্তৃক মুদ্রিত) 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম' (اقتضاء الصراط المستقيم) নামক গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: :

« اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ » . (رواه مسلم) .

"দু'টি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দু'টি তাদের মধ্যে কুফর বলে গণ্য।"[১৪]

ইবনু তাইমিয়্যা র. বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: « هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ » [তাদের মধ্যকার স্বভাব দু'টি কুফরী] এর অর্থ হল: মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এই স্বভাব দু'টি কুফরী; সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে স্বভাব দু'টি কুফরীর অর্থ হল কাজ দু'টি

---

[১৪] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: বংশের প্রতি কটাক্ষের এবং উচ্চস্বরে বিলাপের উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ (باب إِطْلاَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ), হাদিস নং- ২৩৬

কুফরী, যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তির মধ্যে কুফরীর কোনো শাখা পাওয়া যাবে, সে সম্পূর্ণরূপে কাফির হয়ে যাবে, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃত কুফরী বিদ্যমান থাকবে। যেমনিভাবে যে কোনো ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের কোনো একটি শাখা পাওয়া গেলে, তাতেই সেই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তার মধ্যে মূল ঈমান না আসবে। আর আলিফ লাম (ال) দ্বারা নির্দিষ্টভাবে যে কুফর (كفر) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে- যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি:

« ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة » .

"বান্দা এবং শির্ক অথবা কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে শুধু সালাত বর্জন করা।"[১৫] (এর মধ্যকার ال সম্বলিত 'আল-কুফর' শব্দ) এবং যে হাঁ সূচক বাক্যে আলিফ লাম (ال) ব্যতীত অনির্দিষ্টভাবে যে

[১৫] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: সালাত পরিত্যাগকারীর উপর কুফর শব্দের প্রয়োগ (بَاب بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ), হাদিস নং- ২৫৬

কুফর (كفر) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে- এই দু’টির মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

অতঃপর যখন উপরোক্ত দলীলসমূহের দাবি অনুযায়ী একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরীয়তসম্মত কোন ওযর ব্যতীত, সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেওয়ার মত কাফির হিসেবে গণ্য হবে, তখন সে মতটিই সঠিক, যা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. অবলম্বন করেছেন; আর এটা ইমাম শাফেয়ী র. এর দু’টি মতের অন্যতম একটি মত, যেমনটি ইবনু কাছীর র. এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ ﴾ [مريم: ٥٩]

“তাদের পরে আসল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল।” – (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯)। আর ইবনুল কাইয়্যেম র. ‘কিতাবুস সালাত’ (كتاب الصلاة) এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, এটা হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী র. এর দু’টি

মতের অন্যতম; আর ইমাম ত্বাহাভী র. তা স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী থেকেই বর্ণনা করেছেন।

আর এই মতামত বা বক্তব্যের উপরই অধিকাংশ সাহাবী একমত ছিলেন; এমনকি অনেকে এর উপর সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক রাহেমাহুল্লাহ বলেন:

« كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » . (رواه الترمذي والحاكم) .

“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সালাত ব্যতীত অন্য কোনো আমল বর্জন করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না।” [ইমাম তিরমিযী ও হাকেম র. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাদিসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে সহীহ বলেছেন]।[১৬]

[১৬] তিরমিযী, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: সালাত পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যেসব হাদিস এসেছে (باب ما جاء في ترك الصلاة), হাদিস নং- ২৬২২; হাকেম: ১ / ৭

প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ র. বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি কাফির; আর অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত আলেমগণের মতে, বিনা ওযরে সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি সালাতের সময় অতিক্রম করলে কাফির বলে গণ্য হবে।”

ইমাম ইবন হাযম র. উল্লেখ করেন যে, (সালাত বর্জনকারী কাফির) একথা উমর ফারুক, আবদুর রহমান ইবন আউফ, মুয়ায ইবন জাবাল, আবূ হুরায়রা রা. প্রমূখ সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে; অতঃপর তিনি বলেন: “আমরা এসব সম্মানিত সাহাবীগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ পাইনি।” তাঁর থেকে বর্ণনাটি আল্লামা মুনযেরী ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ (الترغيب و الترهيب) এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।[১৭] তিনি আরও কয়েকজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, জাবির ইবন আবদিল্লাহ এবং আবূদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম।

---

১৭ ‘আত-তারগীব ওয়াত তারহীব’ (الترغيب و الترهيب): ১ / ৪৪৫ - ৪৪৬

তারপর তিনি বলেন, উপরোক্ত সাহাবীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে যারা তা বলেছেন তারা হলেন: ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বল, ইসহাক ইবন রাহওয়িয়াহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, নাখ'য়ী, হাকাম ইবন উতাইবা, আইয়ুব সাখতাইয়ানী, আবূ দাউদ আত-তায়ালসী, আবূ বকর ইবন আবি শাইবা, যুহাইর ইবন হারব র. প্রমূখ।

অতঃপর কোন প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করে বসে: সেসব দলীলের কী জবাব হবে, যা ঐসব লোকজন পেশ করে থাকে, যাদের মতে: সালাত বর্জনকারী কাফির নয়?

তার জবাবে আমরা বলব: (তারা যেসব দলীল পেশ করে থাকে) তাতে একথা নেই যে, সালাত বর্জনকারী কাফির হয় না, অথবা সে মুমিন থেকে যায়, অথবা সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, অথবা সে জান্নাতের মধ্যে থাকবে, অথবা অনুরূপ কিছু।

আর যে ব্যক্তি এসব দলীল নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করবে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, এসব দলীল পাঁচ প্রকারের বাইরে নয়, যার মধ্য থেকে একটি প্রকারও সেসব দলীল ও প্রমাণের

পরিপন্থী নয়, যা প্রমাণ করে যে, সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি হচ্ছে কাফির।

প্রথম প্রকার: কতিপয় দুর্বল ও অস্পষ্ট হাদিস দ্বারা তারা নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা কোনো ফলদায়ক নয়।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন দলীল, যার সঙ্গে প্রকৃত মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন কেউ কেউ আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء:٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এর ছেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করেন।” – (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮)। কেননা, আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীতে উল্লেখিত ﴿مَا دُونَ ذَٰلِكَ﴾ এর অর্থ হল: শির্ক থেকে ছোট গুনাহ; তার অর্থ এই নয় যে, ‘শির্ক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ’। এই অর্থের স্বপক্ষে দলীল হল: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন,

তা মিথ্যা মনে করবে, সে ব্যক্তি কাফির এবং সে এমনই কুফরী করল যে, যার কোন ক্ষমা নেই, অথচ তার এই গুনাহটি শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর আমরা যদি মেনেও নেই যে, ﴿ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ﴾ এর অর্থ হল: 'শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ', তাহলে এটা হবে ব্যাপক অর্থপূর্ণ বাণী, যাকে সেসব দলীল দ্বারা বিশেষায়িত করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, শির্ক ছাড়াও কুফরী হতে পারে এবং (সেসব দলীল দ্বারা বিশেষায়িত) যা প্রমাণ করে যে, যে কুফর কাউকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়, সেটি এমন গুনাহ যা ক্ষমা করা হবে না; যদিও তা শির্ক না হয়।

তৃতীয় প্রকার: যেসব দলীল সাধারণ অর্থ বহন করে, তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে ঐসব হাদিস দ্বারা, যা প্রমাণ করে যে, সালাত বর্জনকারী ব্যক্তি কাফির। যেমন মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » . (رواه البخاري و مسلم) .

“যে কোন বান্দা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, তবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।” [বুখারী ও মুসলিম]।[১৮] আর এটি উক্ত হাদিসের এক বর্ণনার শব্দ; অনুরূপ বর্ণনা এসেছে আবূ হুরায়রা[১৯], ‘উবাদা ইবন সামিত[২০] এবং ‘ইতবান ইবন মালেক[২১] রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যেও।

---

[১৮] বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান (كتاب العلم), পরিচ্ছেদ: বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক গোষ্ঠীকে নির্বাচন করা (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا), হাদিস নং- ১২৮; মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে (باب مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ), হাদিস নং- ১৫৭

[১৯] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), হাদিস নং- ১৪৭

[২০] মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), হাদিস নং- ১৫১

[২১] তার তথ্যসূত্র সামনে আসছে।

চতুর্থ প্রকার: যেসব দলীল ‘আম (ব্যাপক অর্থবোধক), যা এমন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক বা শর্তযুক্ত, যার সাথে[22] সালাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যেমন যেমন ‘ইতবান ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ » . (رواه البخاري و مسلم).

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) বলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।” [বুখারী ও মুসলিম]।[২৩] আর মু‘আয ইবন জাবাল

---

[22] অর্থাৎ সে শর্তগুলোর দিকে তাকালে আর সালাত ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সে সব হাদীস সালাত ত্যাগকারীর কাফের হওয়ার বিপরীতে পেশ করা যায় না। বারং সে সব হাদীসই প্রমাণ করে যে তাকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে। [সম্পাদক]

[২৩] বুখারী, অধ্যায়: সালাত (كتاب الصلاة), পরিচ্ছেদ: ঘরের মধ্যে সালাত আদায়ের স্থান (باب المساجد في البيوت), হাদিস নং- ৪১৫; মুসলিম, অধ্যায়: মাসজিদ এবং সালাত আদায়ের স্থানসমূহ (كتاب المساجد و مواضع الصلاة), পরিচ্ছেদ: শরী‘য়ত সম্মত কারণে সালাতের জামায়াতে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি প্রসঙ্গে (باب الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ), হাদিস নং- ১৫২৮

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« ما من أحد يشهد أن لا إلٰه إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار » . (رواه البخاري و مسلم) .

“যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।” [বুখারী ও মুসলিম]।[২৪] সুতরাং হাদিসে উল্লেখিত এই দু’টি সাক্ষ্যতে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং অন্তরের সততার শর্তারোপ করা হয়েছে, যা তাকে সালাত বর্জন করা থেকে বিরত রাখবে; কারণ, যে কোনো ব্যক্তি সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে এই সাক্ষ্য দেবে, তার সততা ও একনিষ্ঠতা

[২৪] বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান (كتاب العلم), পরিচ্ছেদ: বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক গোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক গোষ্ঠীকে নির্বাচন করা (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا), হাদিস নং- ১২৮; মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান (كتاب الإيمان), পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে (باب مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحَرُمَ عَلَى النَّارِ), হাদিস নং- ১৫৭

অবশ্যই তাকে সালাত আদায় করতে বাধ্য করবে; কেননা, সালাত হচ্ছে ইসলামের মূলস্তম্ভ; আর তা হচ্ছে বান্দা এবং তার রবের (প্রভুর) মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম। সুতরাং সে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সৎ হয়, তাহলে অবশ্যই সে এমন কাজ করবে, যা তার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছায়; আর এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে, যে কাজ তার এবং তার প্রভুর মধ্যকার সম্পর্কের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার এই সততা তাকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে সালাত আদায় করতে বাধ্য করবে; কারণ, এসব হচ্ছে ঐ সত্য সাক্ষ্যের আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম প্রকার: সেসব দলীল, যা এমন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, যে অবস্থায় সালাত ত্যাগ করার ওযর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ ইমাম ইবনু মাজাহ র. কর্তৃক হোযায়ফা ইবনুল

ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب .... وتبقى طوائف من الناس ، والشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إلٰه إلا الله ، فنحن نقولها » فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إلٰه إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ، ولا صيام ، ولا نسك ، ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ، ثم ردها عليه ثلاثا ، كل ذلك يعرض عنه حذيفة ، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : « ياصلة ! تنجيهم من النار » ثلاثا » . (رواه ابن ماجه) .

“ইসলাম মুছে যাবে, যেমনিভাবে কাপড়ের নকসা আস্তে আস্তে মুছে যায়; ... “ মানুষের মাঝে অতি বৃদ্ধ ও অক্ষমদের একটি দল থাকবে, যারা বলবে: আমাদের পূর্ব-পূরুষদের এই কালেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’ (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) [আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই] বলতে শুনেছি, অতঃপর আমরাও তাই বলছি।” তারপর সেলা রা. নামক সাহাবী তাঁকে (হোযায়ফা রা. কে) উদ্দেশ্য করে বললেন: শুধু কি ‘লা-ইলাহা ইল্লাহ’ (لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) বলাটাই তাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে, অথচ তারা জানে না যে সালাত, সাওম, হাজ্জ,

যাকাত ও সাদকা কি? হোযায়ফা রা. তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন; অতঃপর তিনি (সেলা রা.) তিনবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, প্রত্যেক বারই হোযায়ফা রা. (উত্তর না দিয়ে) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি (হোযায়ফা রা.) তাঁর দিকে ফিরে তিনবার বললেন: হে সেলা! এই কালেমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে।" [ইবনু মাজাহ]।[২৫]

অতএব, ঐসব মানুষ, যাদেরকে এই কালেমা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিল, তারা ইসলামের বিধানসমূহ ত্যাগের ব্যাপারে নির্দোষ ছিল; কারণ, তারা এই বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল; কাজেই তারা যতটা পালন করেছে, ততটাই তাদের শেষ সামর্থ ছিল। তাদের অবস্থা ঠিক সেই লোকদের মত, যারা ইসলামের বিধি-নিষেধ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়েছে অথবা বিধান পালনের শক্তি অর্জনের পূর্বেই মারা গিয়েছে; যেমন সেই ব্যক্তি, যে (একত্ববাদের) সাক্ষ্য দেয়ার পরে শরী'য়তের বিধিবিধান পালন করার সক্ষমতা অর্জনের

[২৫] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, অধ্যায়: ফিতনা (كتاب الفتن), পরিচ্ছেদ: কুরআন ও ইলম বিলীন হয়ে যাওয়া (باب ذهاب القرآن والعلم), হাদিস নং- ৪০৪৯; হাকেম: ৪ / ৪৭৩; বুসাইরী আয-যাওয়ায়েদ (الزوائد) এর মধ্যে বলেন: হাদিসটির সনদ সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য; আর হাকেম র. বলেন: হাদিসটি ইমাম মুসলিম র. এর শর্তে সহীহ।

পূর্বেই মারা গিয়েছে; অথবা সে কাফিরের দেশে ইসলাম গ্রহণ করল, তারপর শরী'য়তের বিধিবিধানের জ্ঞান লাভের সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই মারা গেল।

ফলকথা এই যে, যারা সালাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে না, তারা যেসব দলীল পেশ করে, সেসব দলীল, যারা সালাত ত্যাগকারীকে কাফির মনে করে তাদের দেয়া দলীল-প্রমাণের সমকক্ষ নয়; কারণ, (যারা কাফির মনে করে না) তারা যেসব দলীল পেশ করে থাকে, সেগুলো হয়তো দুর্বল ও অস্পষ্ট, অথবা তাতে মোটেই তার প্রমাণ নেই; অথবা সেগুলো এমন এমন গুণের সাথে সম্পৃক্ত, যার বর্তমানে সালাত ত্যাগ করা সম্ভব নয়, অথবা সেগুলো এমন অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যাতে সালাত ত্যাগের ওযর গ্রহণযোগ্য, অথবা হতে পারে সেই দলীলগুলো 'আম (ব্যাপাক অর্থবোধক), যা সালাত বর্জনকারীর কুফরীর দলীলসমূহ দ্বারা খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়েছে।

সুতরাং যখন সালাত বর্জনকারী ব্যক্তির কাফির হওয়ার বিষয়টি এমন বলিষ্ঠ দলীল দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল, যে দলীলের বিরুদ্ধে তার সমতুল্য কোনো দলীল নেই; ফলে তার

উপর কুফরী ও মুরতাদ হওয়ার বিধান অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। আর সঙ্গত কারণেই বিধানটি তার ইল্লতের (কারণ বা হেতুর)) সাথে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে সংশ্লিষ্ট; অর্থাৎ সেই বিধানের কারণ পাওয়া গেলে তা প্রযোজ্য হবে, আর যদি কারণ না পাওয়া যায়, তবে তার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সালাত বর্জনের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিধানাবলী প্রসঙ্গে

মুরতাদের উপর কতিপয় ইহলৌকিক ও পরলৌকিক বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে:

প্রথমত: পার্থিব বিধানসমূহ:

১. তার অভিভাবক হওয়ার যোগ্যতা শেষ হয়ে যাওয়া: সুতরাং তাকে এমন কোনো কাজের অভিভাবক বানানো জায়েয হবে না, যে কাজের জন্য ইসলাম অভিভাবকত্বের শর্তারোপ করেছে। আর এর উপর ভিত্তি করে তাকে তার অনুপযুক্ত সন্তান ও অন্যান্যদের উপর অভিভাবক (ওলী) নিযুক্ত করা বৈধ হবে না এবং তার তত্ত্বাবধানে তার যেসব মেয়েরা বা অন্য কেউ রয়েছে, তাদের কাউকে বিয়ে দিতে পারবে না।

আর আমাদের ফিকহশাস্ত্রবিদগণ তাঁদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত গ্রন্থগুলোতে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন: যখন কোনো অভিভাবক মুসলিম মেয়েকে বিবাহ দিবে, তখন সেই অভিভাবকের জন্য শর্ত হল মুসলিম হওয়া; আর তারা বলেন:

" لا ولاية لكافر على مسلمة " .

“মুসলিম মেয়ের উপর কোন কাফির ব্যক্তির অভিভাবকত্ব চলবে না।”

আর আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন:

« لا نكاح إلا بولي مرشد » .

“যোগ্য অভিভাবক ব্যতীত কোনো বিবাহ চলবে না।” আর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল দীন ইসলামকে গ্রহণ করা; আর সবচেয়ে বোকামী বা মূর্খতা ও অযোগ্যতা হচ্ছে কুফরী করা ও ইসলাম থেকে বিমূখ হওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ ﴾ [البقرة: ١٣٠]

“আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ছাড়া ইব্রাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে!” – (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩০)।

২. তার আত্মীয়দের মীরাস (পরিত্যক্ত সম্পদ) থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া: কেননা, কাফির ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না; আর মুসলিম ব্যক্তি কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না; কারণ, উসামা ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ » .(رواه البخاري و مسلم) .

“মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফিরও মুসলিমের ওয়ারিস হবে না।” - (বুখারী ও মুসলিম)।”[২৬]

৩. তার জন্য মক্কা ও তার হারামের এলাকায় প্রবেশ করা হারাম: কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

---

[২৬] বুখারী, অধ্যায়: উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান (كتاب الفرائض), পরিচ্ছেদ: মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না (باب لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ), হাদিস নং- ৬৩৮৩; মুসলিম, অধ্যায়: উত্তরাধিকার বণ্টনের বিধান (كتاب الفرائض), পরিচ্ছেদ: মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হবে না (باب لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ), হাদিস নং- ৪২২৫

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ ﴾ [التوبة: ٢٨]

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে।” – (সূরা আত- তাওবা, আয়াত: ২৮)।

৪. তার দ্বারা যবাইকৃত জীবজন্তু হারাম: অর্থাৎ গৃহপালিত জন্তু, উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি ধরনের জীবজন্তু, যা হালাল হওয়ার জন্য যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে; কারণ, যবেহ করার জন্য অন্যতম শর্ত হল যবেহকারীকে মুসলিম অথবা কিতাবধারী ইহুদী বা খ্রিষ্টান হওয়া; আর মুরতাদ, মূতিপূজক, অগ্নিপূজক বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তি যা যবেহ করবে, তা খাওয়া হালাল হবে না।

প্রখ্যাত তাফসীরকারক খাযেন র. তাঁর তাফসীরের মধ্যে বলেছেন: “আলেমগণ এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, অগ্নিপূজক, আরবের মুশরিকগণ ও মূতিপূজারীগণসহ সকল মুশরিক এবং যাদেরকে কোনো কিতাব দেয়া হয় নি, এমন সকল ব্যক্তির যবাইকৃত সকল পশু-পাখি হারাম।”

আর ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. বলেন:

" لا أعلم أحدا بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة " .

“কোন ব্যক্তি এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই; তবে হ্যাঁ, বিদ‘আতপন্থী ব্যক্তি হলে বলতে পারে।”

৫. তার মৃত্যুর পরে তার উপর জানাযার সালাত পড়া এবং তার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দো‘আ করা হারাম; কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ ٨٤ ﴾ [التوبة: ٨٤]

“আর তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনো তার জন্য জানাযার সালাত পড়বেন না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এবং ফাসেক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।” – (সূরা আত- তাওবা, আয়াত: ৮৪); আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ۝١١٣ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ ۝١١٤ ﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤]

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। আর ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" – (সূরা আত- তাওবা, আয়াত: ১১৩ - ১১৪)।

আর যে কোন কারণেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করল, তার জন্য কোনো মানুষের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমতের দো'আ করাটা দো'আর ক্ষেত্রে এক প্রকার বাড়াবাড়ির শামিল, আল্লাহর সাথে এক ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনগণের পথ থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে কিভাবে সম্ভব যে, সে এমন ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত ও রহমতের দো‘আ করবে, যার মৃত্যু হয়েছে কুফরী অবস্থায় এবং সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন? যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَٰفِرِينَ ٩٨ ﴾ [البقرة: ٩٨]

“যে কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্তাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিব্রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের শত্রু।” – (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯৮)। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তিনি স্বয়ং প্রত্যেক কাফিরের শত্রু। ফলে প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য হল প্রত্যেক কাফির থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ۝٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ۝٢٧ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]

“আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর নিশ্চয় তিনি শীঘ্রই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন।” – (সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬ - ২৭); আর আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ ﴾ [الممتحنة: ٤]

“অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সংগে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে

অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন।” – (সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ৪)। আর এর মাধ্যমে সে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারে, যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ ﴾ [التوبة: ٣]

“আর মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয় মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।” – (সূরা আত- তাওবা, আয়াত: ৩)।

আর ঈমানের সবচেয়ে মজবুত রশি হল: আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আর আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা, যাতে আপনি আপনার নিজের

ভালবাসার স্বার্থে, ঘৃণার স্বার্থে, বন্ধুত্ব স্থাপনে এবং শত্রুতা প্রদর্শনে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়ে যেতে পারেন।

৬. মুসলিম নারীকে তার পক্ষে বিয়ে করা হারাম: কারণ, সে কাফির; আর কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য এবং ইজমা তথা মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যমত্যের দ্বারা প্রমাণিত যে, কাফির ব্যক্তির জন্য মুসলিম নারী বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ ﴾ [الممتحنة: ١٠]

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো; আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন নারী, তবে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো না। মুমিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।" – (সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত: ১০)।

আল-মুগনী (المغني) নামক কিতাবে (৬ / ৫৯২) বলা হয়েছে: “আহলে কিতাব ব্যতীত সমস্ত কাফিরের মেয়েরা এবং তাদের যবাইকৃত জীবজন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।” তিনি আরো বলেন: “মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) মেয়েকে বিয়ে করা হারাম, সে যে কোনো ধর্মের অনুসারীই হউক না কেন; কারণ, তার জন্য ঐ দীনের অনুসারীর বিধান সাব্যস্ত হয় নি, যে দীনে সে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।”

আর একই গ্রন্থের মুরতাদের পরিচ্ছেদে (৮ / ১৩০) বলা হয়েছে: “যদি সে বিয়ে করে, তার বিয়ে শুদ্ধ হবে না; কারণ, তাকে বিয়ের উপর স্থির রাখা যায় না; আর যা বিয়ের উপর স্থির রাখতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তা বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, যেমন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় কাফির কর্তৃক মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সময়।”[২৭]

---

[২৭] হানাফী কিতাব মাজমা‘উল আনহুর (المجمع الأنهر) এর কাফিরের বিয়ে নামক পরিচ্ছেদ (باب نكاح الكافر) এর শেষে (১ / ২০২) রয়েছে: “মুরতাদ পুরুষ এবং মুরতাদ নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয়।” কারণ, এই ব্যাপারে সকল সাহাবীর ঐক্যবদ্ধ ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

সুতরাং আপনি তো দেখতে পেলেন যে, মুরতাদ মেয়েকে বিয়ে করা পরিষ্কাভাবে হারাম করা হয়েছে; অপরপক্ষে মুরতাদ পুরুষের সঙ্গে (মুসলিম মেয়ের) বিয়ে অশুদ্ধ; অতএব, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে কী হতে পারে?

আল-মুগনী (المغني) নামক কিতাবে (৬ / ২৯৮) বলা হয়েছে: "যখন স্বামী ও স্ত্রীর কোনো একজন বাসরের পূর্বেই মুরতাদ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের একজন অপর জনের ওয়ারিস (সম্পদের উত্তরাধিকারী) হবে না। আর যদি বাসরের পরে মুরতাদ হয়, তাহলে এই ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে: তন্মধ্যে প্রথম মতটি হল: সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যকার বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; আর দ্বিতীয় মত হল: ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিয়ে স্থগিত হয়ে থাকবে (ইদ্দত পূর্ণ হলেই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে)।"

আল-মুগনী (المغني) নামক কিতাবে (৬ / ৬৩৯) আরো বলা হয়েছে: "বাসরের পূর্বে মুরতাদ হওয়ার কারণে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে

যাবে- এটা সকল আলেমের বক্তব্য এবং এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হয়েছে।”

আর তাতে আরো বলা হয়েছে: বাসরের পর মুরতাদ হলে ইমাম মালেক ও আবূ হানিফা র. এর মতে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; আর ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হবে।

এ কথার দাবি হচ্ছে, চার ইমামের ঐক্যবদ্ধ মতের ভিত্তিতে স্বামী ও স্ত্রীর কোনো একজন মুরতাদ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; কিন্তু যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি বাসরের পর মুরতাদ হয়, তবে ইমাম মালেক ও ইমাম আবূ হানিফা র. এর মতে তাৎক্ষণিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে; আর ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে ইদ্দত পার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর বিচ্ছেদ ঘটবে; উপরোক্ত দুই মাযহাবের অনুরূপ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. থেকে দু’টি বর্ণনা রয়েছে।

আল-মুগনী (المغني) নামক গ্রন্থের ৬৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে: “স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি একই সঙ্গে মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাদের হুকুমও অনুরূপ, যেমন হুকুম রয়েছে উভয়ের মধ্য থেকে কোনো একজন মুরতাদ হলে; যদি বাসরের পূর্বে মুরতাদ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; আর যদি বাসরের পর মুরতাদ হয়, তবে কি সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, নাকি ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হবে? এই ব্যাপারে দু‘টি বর্ণনা রয়েছে: ইমাম শাফেয়ী র. এর মতে, ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। আর ইমাম আবূ হানিফা র. এর মতে, এই ক্ষেত্রে (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একই সঙ্গে মুরতাদ হলে) ইস্তিহসান (استحسان) এর ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না; কারণ, তাদের উভয়ের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় নি; আর এটা ঠিক তেমনই, যেমন দু‘জনই যদি একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে।” অতঃপর আল-মুগনী (المغني) নামক গ্রন্থের লেখক তাঁর (ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহর) উক্ত কিয়াস এর (طرد) তথা গঠনমূলক ও (عكس) বা বিপরীতমূখী প্রমাণ প্রদানের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন।

আর যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুরতাদের বিবাহ কোনো মুসলিমের সঙ্গে শুদ্ধ নয়, চাই সে নারী হউক বা পুরুষ; আর এটাই কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত; আর এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সালাত বর্জনকারী হচ্ছে কাফির, যা কুরআন, সুন্নাহ ও সকল সাহাবীর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। আর এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় না করে এবং কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করে, তাহলে তার বিয়ে শুদ্ধ নয়, আর এই বন্ধন দ্বারা সেই নারী তার জন্য হালালও নয়; তবে সে যদি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করে এবং ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর বিবাহকে আবার নবায়ন করা আবশ্যক হবে। আর অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে ঐ নারীর ক্ষেত্রেও, যে সালাত আদায় করে না।

আর এটা কাফিরদের কুফরী অবস্থায় সংঘটিত বিবাহ থেকে ভিন্ন রকম; যেমন একজন কাফির পুরুষ একজন কাফির মেয়েকে বিয়ে করল, অতঃপর উক্ত স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করল, এই পরিস্থিতিতে যদি সে মেয়ের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি বাসরের

পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; আর যদি সে মেয়ের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি বাসরের পরে হয়ে থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না, বরং স্বামীর ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় থাকবে; তারপর যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই স্বামী ইসলাম গ্রহণ, তাহলে সে মেয়ে তারই স্ত্রীরূপে বহাল থাকবে। আর যদি স্বামীর ইসলামের পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেই স্বামীর জন্য তার উপর কোনো অধিকার থাকবে না; কারণ, এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সেই মেয়ের ইসলাম গ্রহণ করার সময় থেকেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কাফিরগণ তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে একই সময় ইসলাম গ্রহণ করত এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাদের নিজ নিজ বিয়ের উপর স্থির রাখতেন; তবে যদি তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকত, তাহলে ভিন্ন কথা, যেমন স্বামী-স্ত্রী দু‘জনই অগ্নিপূজক এবং তাদের উভয়ের মাঝে এমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, যার কারণে তাদের একে অপরের সঙ্গে বিয়ে হারাম। অতএব, যখন তারা দু‘জন ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন

তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হওয়ার কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে।

আর এই মাসআলাটি ঐ মুসলিম ব্যক্তির মাসআলার মত নয়, যে সালাত ত্যাগ করার কারণে কাফির হয়েছে, অতঃপর মুসলিম নারীকে বিয়ে করেছে; কারণ, মুসলিম নারী কাফিরের জন্য হালাল নয়, এটা কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, যদিও সে কাফিরটি মৌলিকভাবে মুরতাদ নয়; আর এই জন্য যদি কোনো কাফির কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ে করে, তাহলে বিয়েটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়া আবশ্যক (ওয়াজিব) হবে; আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে আবার নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীরেকে তার জন্য এটা সম্ভব হবে না।

৭. সালাত বর্জনকারী কর্তৃক মুসলিম নারীকে বিয়ে করার পর জন্ম হওয়া সন্তানদের বিধান: মায়ের দিকে লক্ষ্য করলে সর্বাবস্থায় সন্তান হচ্ছে মায়ের। আর স্বামীর দিকে লক্ষ্য করলে যারা সালাত বর্জনকারীকে কাফির মনে করেন না, তাদের মতে সেসব সন্তান

তার সাথে সম্পৃক্ত হবে; কারণ, (তাদের মতে) তার বিবাহ শুদ্ধ ছিল। আর যারা সালাত বর্জনকারীকে কাফির মনে করেন এবং এটাই সঠিক, যেমনটি তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে; আমরা সেই মতের উপর ভিত্তি করে বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখব:

* যদি স্বামী একথা না জানে যে, তার বিবাহ বাতিল ছিল অথবা তার এই বিশ্বাস ছিল না যে (সালাত বর্জনকারী কাফির), তাহলে সন্তানগুলো তার সন্তান বলেই গণ্য হবে; কারণ, এই অবস্থায় তার ধারণা মতে স্ত্রী মিলন বৈধ ছিল; সুতরাং তার এই মিলন সংশয়ের মিলন ছিল, যাতে বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

* আর স্বামী যদি একথা জানে যে, তার বিবাহ বাতিল ছিল অথবা তার এই বিশ্বাস ছিল যে (সালাত বর্জনকারী কাফির), তাহলে সন্তানগুলো তার সন্তান বলে গণ্য হবে না; কারণ, তার সন্তান এমন বীর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যার সম্বন্ধে তার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল তার সহবাস হারাম হয়েছে; কেননা, তার সেই সহবাস হয়েছে এমন এক স্ত্রীর সাথে, যে স্ত্রী তার জন্য হালাল ছিল না।

দ্বিতীয়ত: মুরতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পরকালীন বিধানসমূহ:

১. ফিরিশ্তগণ কর্তৃক তাকে ধমকের সুরে তিরস্কার ও আঘাত করা, বরং তাঁরা তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করবে; আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۝٥٠ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝٥١ ﴾ [الانفال: ٥٠، ٥١]

“আর আপনি যদি দেখতে পেতেন যখন ফিরিশ্তাগণ যারা কুফরী করেছে তাদের প্রাণ হরণ করছিল, তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করছিল; আর বলছিল, তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর। এটা তো সে কারণে, যা তোমাদের হাত আগে পাঠিয়েছিল, আর আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নন।” – (সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০ - ৫১)।

২. তার হাশর হবে কাফির ও মুশরিকদের সাথে; কেননা, সে তাদেরই একজন; কারণ, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزۡوَٰجَهُمۡ وَمَا كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهۡدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡجَحِيمِ ٢٣ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣]

"(ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে,) 'একত্র কর যালিম ও তাদের সহচরদেরকে এবং তাদেরকে, যাদের 'ইবাদাত করত তারা আল্লাহর পরিবর্তে। আর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।" – (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ২২ - ২৩)। আর আয়াতে উল্লেখিত " أزواج " **শব্দটি** " زوج " **শব্দের** বহুবচন; আর তা হল " الصنف "(শ্রেণী বা প্রকার); অর্থাৎ যারা যালিম এবং তাদের শ্রেণীভুক্ত কাফির ও যালিমদেরকে একসাথে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে।

৩. তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে চিরদিন অবস্থান করবে; কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦ ﴾ [الاحزاب: ٦٤، ٦٦]

“নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক পাবে না, কোন সাহায্যকারীও নয়। যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম, আর রাসূলকে মানতাম!” – (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪ - ৬৬)।

আর এখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল এই বিরাট মাসআলার ব্যাপারে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম, যে সমস্যায় বহু লোকজন জর্জরিত।

* আর যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায়, তার জন্য তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। সুতরাং হে মুসলিম ভাই! অতীতের পাপের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করুন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, আমি আর পাপের কাজে যাব না এবং খুব বেশি বেশি সৎ কাজ করব; আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ٧١ ﴾ [الفرقان: ٦٩، ٧٠]

“তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের গুণাহসমূহ নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকাজ করে, সে তো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।” – (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭০ - ৭১)।

মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে স্বীয় কাজে যোগ্যতা দান করেন, আর আমাদের সকলকে তাঁর সঠিক ও সোজা পথ প্রদর্শন করেন; তাঁদের পথ, যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন: নবীগণ এবং সিদ্দীক (সত্যবাদী), শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথে নয়।

*** আল্লাহ তা‘আলার এক নগণ্য বান্দার কলমে লেখা:**

মুহাম্মদ সালেহ আল-‘উসাইমীন

২৩/ ২/ ১৪০৭ হি.

*** * ***